14) পালযুগে বাংলায় স্থাপত্য - ভাস্কর্য ও চিত্রকলা যা বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করো।

→ পাল বংশের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়। হর্ষবর্ধনের পর পাল বংশই আর্যাবর্তে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী শেষ রাজবংশ হিসাবে পরিচিত। হর্ষবর্ধনের পর পালরাজাগণই উত্তর ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলাদেশে পাল রাজাদের দীর্ঘ ৪০০ বছরের শাসন নানা কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে - অষ্টম শতাব্দীতে পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা বাঙালি জাতি ও তার ভাষা এবং সাংস্কৃতিক বিবর্তনে কল্পনাতীত ভাবে এক যুগান্তকারী ঘটনা। ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, স্থাপত্য-ভাস্কর্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাল যুগ বাঙালীর এক নতুন জাতীয় জীবনের সূত্রপাত ঘটায়।

বাংলার ইতিহাসে পাল রাজগণ অধিকাংশই ছিলেন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষক। বাংলা ভাষার আদিরূপ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত পালযুগে সাহিত্য ও জ্ঞান - বিজ্ঞান, দর্শনের ব্যাপক চর্চা লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া চারুশিল্পের ক্ষেত্রে অর্থাৎ স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় পালযুগ বিশেষ অবদান রেখে গেছে। পালপর্বের এইসমস্ত লৌকিক স্থাপত্যের নিদর্শন বিধৃত আছে সমকালীন মৃৎ ও প্রস্তর ফলকে।

স্তূপ: পাল আমলের শিল্পের মধ্যে স্তূপ এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। পাল পর্বীয় ধর্মগত স্থাপত্যের মধ্যে এক স্তূপ সম্পর্কে বিভিন্ন বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ থেকে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। প্রখ্যাত চীনা পর্যটক বাংলাদেশের অসংখ্য স্তূপের কথা বলেছেন। তবে সেগুলি আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন। অধ্যাপক পাশী সাহেব স্তূপগুলির এই পরিণামের জন্য বাংলাদেশের জলবায়ু এবং মুসলমান আক্রমণকেই দায়ী করেছেন। তৎকালীন যুগে নিবেদনরূপে সেগুলি নির্মাণ করা হয়েছিল। এই স্তূপগুলির মধ্যে থেকে বৌদ্ধমূর্তি উৎকীর্ণ অনেক মাটির শীলমোহর পাওয়া যায়, যা থেকে ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন বুদ্ধের দেহাবশেষের পরিবর্তে

এই ধরনের ফলকে তাঁর ধর্মকারীর স্থাপনা করে সেগুলি পূজিত হত। সমসাময়িক পান্ডুলিপি ও চিত্র স্তূপের প্রতিকৃতি থেকে অনেকেই অনুমান করেন স্তূপগুলি ভিত, বেদী, মেধী, অন্ড, হার্মিকা ও ছত্রাবলী - এই ছয়টি অংশ নিয়ে গঠিত হত। পাল আমলের স্তূপগুলির ভগ্নাবশেষ পাহাড়পুর, বহুলারা, ভরতপুর এবং ঢাকা জেলায় আশরফপুর গ্রামে আনুমানিক অষ্টম শতাব্দীর একটি ব্রোঞ্জের ছোটো স্তূপ পাওয়া গিয়েছে। শিল্পগত মানের দিক থেকে এই স্তূপগুলি ছিল খুবই সাদামাটা।

বিহার

পালযুগে বিহার ছিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ নির্দশন। প্রথমদিকে এগুলিতে বৌদ্ধ ভিক্ষুরাই বাস করতেন। পরে এগুলি শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। স্তূপের তুলনায় পালযুগে বিহারের সংখ্যাই বেশি ছিল। রাজশাহীর অন্তর্গত পাহাড়পুরে যে বৌদ্ধবিহার ~~অবস্থিত তা~~ আবিষ্কৃত হয়েছে তা স্থাপত্য শিল্পের এক শ্রেষ্ঠ নির্দশন। ভাগলপুর জেলার আন্টিচকে ধর্মপাল বিক্রমশীল বিহার নির্মাণ করেন। এছাড়া বিহারের ওদন্তপুরী ও সোমপুরী বিহার ছিল উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন লেখ ও সাহিত্য থেকে জানা যায়- পাল আমলে বেশকিছু বিহার নির্মিত হয়েছিল।

মন্দির

বিভিন্ন সমসাময়িক ঐতিহাসিক উপাদান থেকে পালযুগে অসংখ্য মন্দির নির্মাণের কথা জানা যায়। এ যুগে নির্মিত মন্দির সমূহের মধ্যে পাহাড়পুরের বৃহদায়তন ও বহুতল মন্দিরটি ছিল উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরের সিংহভাগ ধর্মপালের রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল পোড়ামাটির ইট ও কাদার গাঁথনিতে। এটি উত্তর-দক্ষিণে 107.6 মিটার ও পূর্ব-পশ্চিমে 95.77 মিটার লম্বা। মন্দিরের প্রতিটি দিকে একটি করে পূজা স্থান ছিল এবং কেন্দ্রস্থলে ছিল এক বৃহদায়তন চতুষ্কোণ স্তম্ভ। অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে সজ্জিত ছিল। তবে পালযুগের অধিকাংশ মন্দিরগুলির বিলুপ্তির ফলে বাংলার স্থাপত্যের গরিমায় গভীর আঘাত হয় বলে অনেকে ঐতিহাসিক বিবেচনা করেছেন। যা টিকে আছে তা একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর তৈরি এবং পাহাড়পুরকে কেন্দ্র করে। তবে সম্প্রতি চন্দ্রকেতুগড় খননকার্যের ফলে একটি বড়ো মন্দিরের

নিদর্শন পাওয়া গেছে, যা অনেকেই মনে করেন পালযুগে স্থাপিত হয়েছিল। এ যুগের মন্দিরের মধ্যে বর্ধমান জেলার বরাকরের চতুর্থ মন্দির, বাঁকুড়া জেলার বহুলারার সিদ্ধেশ্বর মন্দির এবং দেউর গ্রামের সরেশ্বর এবং সল্লেশ্বর মন্দির, সুন্দরবনের জটার দেউল এবং পুরুলিয়ার বান্দা গ্রামের প্রস্তর মন্দিরটি এযুগের কীর্তি।

স্থাপত্য ভাস্কর্য

পাল পর্বের ভাস্কর্য শিল্পেও এক অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছিল। গুপ্তযুগের ভাস্কর্য রীতির একঘেয়েমি থেকে মুক্ত হয়ে পালযুগের বাংলা ভাস্কর্য শিল্পে নিজবৈশিষ্ট্য মণ্ডিত হয়। পাহাড় পুরের ভাস্কর্য সবথেকে স্বরসম্পদ ইঙ্গিতবহন করে। পাহাড়পুর পালযুগের ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ ভাণ্ডার। এখানে মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির মূর্তি - স্বর্ণমূর্তি, বিষ্ণুমূর্তি প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে মাটি ছাড়াও কোন কোন মূর্তি সূক্ষ্ম বা অপেক্ষাকৃত মোটাদানার পাথরে নির্মিত। আবার কোনো মূর্তি পিতল বা মিশ্রধাতু বা সোনা, রূপা দিয়ে নির্মিত হত। মূর্তিগুলি অধিকাংশ দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট ভঙ্গিমায় উপস্থাপিত করা হয়েছিল। তবে কোথাও কোথাও দণ্ডায়মানভঙ্গির আবার বিভিন্নরূপ লক্ষ্য করা গিয়েছে।

পালযুগের ইতিহাসকে অনেকে বাংলার এক স্মরণীয় অধ্যায়রূপে চিহ্নিত করেছেন। স্থাপত্য-ভাস্কর্যে পাহাড়পুরকে কেন্দ্র করে যে সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় তা থেকে অনেকেই অনুমান করেন পাহাড়পুরের মতোই বিভিন্ন জায়গায় তাদের স্থাপত্য-কীর্তি ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সেগুলি ধ্বংস হয়। অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার এই মন্তব্য করেছেন — "বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসে পাল সাম্রাজ্যের অনুরূপ শক্তি বা সমৃদ্ধির পরিচয় পূর্বে বা পরে কখনোই পাওয়া যায়নি।"